দ্য প্রিজনার অভ জেন্ডা

অ্যান্টনি হোপ

অনুবাদ – অনিরুদ্ধ চৌধুরী

নটিলাস
এক রোমাঞ্চকর যাত্রা

প্রথম পরিচ্ছেদ
এলফবার্গ এবং র‍্যাসেনডিল

আমার নাম রুডলফ র‍্যাসেনডিল। আমার ভাই রবার্ট-এর লন্ডনের বাড়ির বৈঠকখানায় ভাবি রোজের সঙ্গে আমার যে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হয়েছিল, তা লিপিবদ্ধ করবার আগে আমি দুটি পরিবারের কয়েক পুরুষ আগেকার ইতিহাস সম্বন্ধে দুটি কথা বলতে চাই। এই দুটি পরিবার হলো এলফবার্গ এবং র‍্যাসেনডিল পরিবার। এই ইতিহাস আলোচনার মধ্য দিয়েই আমি দেখাব কীভাবে র‍্যাসেনডিল পরিবারের সন্তান হলেও কোন সূত্রে এলফবার্গ বংশের রক্ত আমার ধমনিতে প্রবহমান।

১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে আমার পূর্বপুরুষ জেমস ব্রিটিশ দূত হিসেবে রুরিতানিয়া রাজ্যের এলফবার্গ বংশের রাজা তৃতীয় রুডলফের সভায় গিয়েছিলেন। জেমস নিজেও ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান। তিনি ছিলেন বার্লেসডনের পঞ্চম আর্ল এবং ব্যাসেডিলের দ্বাবিংশ ব্যারন।

এলফবার্গ বংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রুরিতানিয়া রাজ্য শাসন করেছে। এই মুহূর্তেও সেই বংশের একজন সন্তান রুরিতানিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। মাঝখানে অতি সামান্য কালের বিরতি। এই বিরতি কালে এলফবার্গ বংশের মূলধারা রুরিতানিয়ায় রাজত্ব করেনি, রাজত্ব করেছিল—

যাক, সে কাহিনিই তো বলতে বসেছি। আগে থেকে পরের কথা বলে কাহিনির রসভঙ্গ করতে চাইছি না।

আমার পূর্বপুরুষ জেমস, লর্ড বার্লেসডন রুরিতানিয়ায় ব্রিটিশ রাজদূত হয়ে যাবার অল্পদিন আগে থেকেই সে রাজ্যে একটা বিরাট বিবাহ উৎসবের প্রস্তুতি চলছিল। রাজা তৃতীয় রুডলফের ছোট বোন অ্যামেলিয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছিল ইউরোপের এক মহাগৌরবময় প্রাচীনতম রাজবংশের যুবরাজের সঙ্গে। এই বংশ ইউরোপের রাজন্য—সমাজের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্থানের অধিকারী। রাজকন্যা

অ্যামেলিয়াও অপূর্ব সুন্দরী। তিনি দীর্ঘাঙ্গিণী, তাঁর নাক তীক্ষ্ণ এবং সরল, মাথায় এক মাথা গাঢ় লাল রঙের চুল। এই তীক্ষ্ণ নাসিকা, রক্তবর্ণ কেশদামই হচ্ছে এলফবার্গ বংশের বৈশিষ্ট্য।

লর্ড বার্লেসডন যখন ব্রিটিশ রাজদূত হয়ে রুরিতানিয়ায় পৌঁছলেন তখনও রাজকন্যা অ্যামেলিয়ার বিয়ে হতে কয়েক সপ্তাহ বাকি ছিল। অ্যামেলিয়া লর্ড বার্লেসডনকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলেন। রাজকন্যার প্রাসাদে লর্ড বার্লেসডনকে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল, হয়তো এই ব্যাপারটা নিয়ে কেউ কেউ মৃদু মন্তব্যও করে থাকতে পারে। কিন্তু এর পরে যা ঘটল তাতে কেবল রুরিতানিয়ানরাই আহত হলো না। ইউরোপের প্রত্যেক দেশ এবং রাজসভাই আহত হলো। ব্রিটিশ অভিজাতরা আঘাত পেল সবচেয়ে বেশি। বিয়ের একদিন আগে রাজকন্যা অ্যামেলিয়া পালালেন লর্ড বার্লেসডনের সঙ্গে। প্রতিবেশী রাজ্যের এক ছোট শহরে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। প্রেমের জন্য অ্যামেলিয়া ত্যাগ করলেন এক শক্তিমান সাম্রাজ্যের যুবরাণীর এবং ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞীর আসন।

পঞ্চশরের বাণবিদ্ধ হয়ে নর-নারী কত কিছুই না ত্যাগ করে। স্ত্রীকে নিয়ে লর্ড বার্লেসডন ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন। কাউন্টেস অ্যামেলিয়া আমাদের পরিবারে ইউরোপের এক খানদানি বংশের রক্ত নিয়ে এলেও বার্লেসডন পরিবার তাঁকে পুরোপুরি ক্ষমা করতে পারল না। কারণ হলো নির্দিষ্ট পাত্রকে ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা। এটা যে একটা বিরাট কেলেঙ্কারির কাজ হয়েছিল সে কথা এতদিনেও আমাদের পরিবারের লোকেরা ভুলতে পারেনি। বিশেষ করে আজও আমার ভাবি সেই বিদেশিনি মহিলা সম্পর্কে একটু বিদ্বেষ ভাবই পোষণ করেন।

কিন্তু এ মনোভাব তো যা ঘটনা তাকে পালটাতে পারে না। বার্লেসডনে র‍্যাসেনডিল পরিবারের একটি চিত্রশালা রয়েছে। চিত্রশালায় রয়েছে এই বংশের নারী-পুরুষদের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। দেড়শ বছরের পুরোনো ছবিও রয়েছে এখানে।

বিগত দেড়শ বছরের পাঁচখানা কি ছ'খানা ছবির একটু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই পাঁচ-ছখানা ছবির মধ্যে ষষ্ঠ আর্লের ছবিখানাও রয়েছে। বৈশিষ্ট্যের জন্য ছবিগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বৈশিষ্ট্যটা হলো এইখানে, এই পাঁচ ছ'খানা ছবির নাক অসাধারণ লম্বা, খাড়া এবং টিকোলো, মাথার চুল গাঢ়লাল—প্রায় রক্ত রাঙাই বলা যেতে পারে। এগুলো

হলো এলফবার্গ বংশের বৈশিষ্ট্য। এ পাঁচ-ছ'খানা ছবির চোখের রং-ও নীল, অথচ সাধারণ ভাবে র‍্যাসেনডিল পরিবারের সন্তানদের চোখের রং কালো। চিত্রশালায় রাজকন্যা অ্যামেলিয়ারও একখানা ছবি রয়েছে। এই পাঁচ ছ'খানা ছবির মুখের সঙ্গে অ্যামেলিয়ার মুখের সাদৃশ্য বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। রুরিতানিয়ার রাজরক্ত যে এখনও র‍্যাসেনডিল পরিবারের সন্তানদের মধ্যে প্রবলভাবে বইছে এগুলো হলো তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আমার নিজের নাক অসাধারণ লম্বা, খাড়া আর টিকোলো। মাথার চুল রক্ত-রাঙা, চোখের রং নীলাভ, এলফবার্গ চেহারার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি যেন আমার মধ্যে ফুটে উঠেছে। বোধ করি এজন্যই এলফবার্গ রাজবংশের সন্তানদের প্রতি আমি এক ধরনের ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব পোষণ করতাম। এবার ফিরে আসা যাক রোজ ভাবির সঙ্গে আমার কথাবার্তার প্রসঙ্গে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ভাবি-দেবর সংবাদ

ভাবি বললেন, 'কবে তুমি কোনো কাজকর্ম করবে রুডলফ?'

'প্রিয় ভাবি সাহেবা, আমার কোনো কাজকর্ম করবার দরকারটাই বা কী? আমার অবস্থাটা তো বেশ স্বস্তিকরই। আমার যা আয় তা তো আমার চাহিদার পক্ষে যথেষ্ট। আমার সামাজিক অবস্থাও তো অন্যের ঈর্ষা উৎপাদন করবার মতো। আমি দেশের এক খানদানি পরিবারের সন্তান, লর্ড বার্লেসডন আমার বড়ভাই। কাউন্টেস রোজ বার্লেসডনের মতো সুন্দরী মহিলার আমি দেবর। এই তো যথেষ্ট। আর কী চাই?'

'তোমার বয়স হলো উনত্রিশ। কিন্তু এতখানি বয়স পর্যন্ত তুমি কিছু করলে না, করলে কেবল...

'আলসেমি,' রোজ ভাবির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললাম, 'খুব সত্যি কথা, আলসেমি ছাড়া এ যাবৎ কাল আমি কিছু করিনি। কিন্তু ভাবি আমাদের পরিবারের ছেলেদের কোনো কাজকর্ম না করলেও চলে।'

ভাবির বোধ হয় আঁতে একটু ঘা লাগল, কেননা তাঁর পিতৃকুল বংশ মর্যাদায় অভিজাত হলেও র‍্যাসেনডিল পরিবারের মতো সে পরিবারের কাঞ্চন কৌলিন্য ছিল না। কাজেই একটু উষ্ণ স্বরেই তিনি বললেন, 'তোমাদের এইসব খানদানি পরিবার থেকে সাধারণ পরিবারগুলি অনেক ভালো। সে সব পরিবারে নানা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি থাকে না।'

মাথা চুলকাতে লাগলাম, বুঝলাম ভাবি আমাদের পরিবারের অতীত ইতিহাসের উল্লেখ করছেন। এই অতীত ইতিহাসটা আমি একটু আগেই বলেছি।

ভাগ্য ভালো বব-এর মাথার চুল কালো, বব হলেন আমার ভাই রবার্ট র‍্যাসেনডিল। তাঁর চুলের রং কালো না হয়ে লাল হলে রোজ ভাবির কি এমন সর্বনাশ হতো তা কিন্তু তিনি কোনোদিন খুলে বলেননি।

এমনি সময়ে ভাই ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন, 'ব্যাপার কী, তোমাদের

দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।'

'ভাবি অভিযোগ করছেন আমি কিছু করি না, আর আমার মাথার চুলই বা লাল কেন?' আমি যেন ভাবির কথায় খুব আহত হয়েছি এমনি ভাবে বললাম আসলে আমি একটু মজা করতে চাইছিলাম।

'অবশ্য চুলের রঙের ওপর ওর কোনো হাত নেই,' ভাবি স্বীকার করলেন।

'চুলের ঐ সিঁদুরে লাল রং প্রতি প্রজন্মে একবার দেখা যায়। ও রকম নাকও তা-ই। ভাগ্যক্রমে আমার রুডলফ ভাইটি দুটিই পেয়ে বসেছেন,' একটু হালকা ঘুরেই আমার ভাই বললেন। 'ওরকম নাক আর চুল না হলেই আমি খুশি হতাম,' ভাবি মন্তব্য করলেন।

'আমার তো এরকম নাক আর চুল খুব পছন্দ,' এ কথা বলে আসন থেকে উঠে আমি রাজকন্যা অ্যামেলিয়ার ছবির কাছে গেলাম তারপর নত হয়ে শ্রদ্ধা জানালাম আমাদের বংশের অতীত দিনের জননীকে।

ভাবি অধৈর্যের সঙ্গে আক্ষেপ করলেন, 'ঐ ছবিখানা... ঐ ছবিখানাই হলো... রবার্ট ও ছবিখানাকে এখান থেকে সরিয়ে নিলে আমি সত্যিই খুশি হব।'

'কেন? কী ব্যাপার?' রবার্টের কণ্ঠে অকৃত্রিম বিস্ময়।

'হায় ঈশ্বর!' ভাইয়ের সুরে সুর মিলিয়ে আমি বললাম।

'ছবিখানা সরিয়ে নিয়ে সেই পুরোনো কেলেঙ্কারির কথাটা ভুলে থাকা যায়।'

'মোটেই না মোটেই না,' মাথা নেড়ে রবার্ট বললেন, 'রুডলফ যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ রাজকন্যা অ্যামেলিয়ার কথা ভুলব কী করে?'

'ভুলবার দরকারটাই বা কী? ভাইয়ের কথায় আমি ফোড়ন দিলাম, 'আমার চেহারা এলফবার্গদের মতো হয়েছে, এ চেহারাটা আমার খুব পছন্দ।'

'কেন? পছন্দ কেন?' রেগেমেগে রোজ ভাবি জিজ্ঞেস করলেন।

'কেননা ইউরোপের এক রাজবংশের সন্তানদের সঙ্গে আমার চেহারার মিল রয়েছে, আর তাছাড়া...'

'তাছাড়া?' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রোজ ভাবি প্রশ্ন করলেন।

'তাছাড়া আমাদের বংশের সেই অতীত দিনের জননীকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

'কেন শ্রদ্ধা কর?'

'তিনি প্রেমের জন্য বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। যুবরাণীর পদ-ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞীর আসন ত্যাগ করে তিনি বরণ করেছিলেন সাধারণ এক জমিদার গৃহিনীর পদ।'

'দেশ আর আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে এসেছিলেন তিনি, সেটা বুঝি কোনো অন্যায় নয়?' ভাবির গলায় বাজের ঝাঁজ।

'দেশ আর আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করলেও তাঁর দেশপ্রেম আর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ভালোবাসার কোনো অভাব ছিল না,' আমি উত্তর দিলাম।

'কী রকম?' ভাবি এবার একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন।

'কেন, অ্যামেলিয়া তো তাঁর ছেলের নাম দিয়েছিলেন রুডলফ। এ নামটা তো তার দেশের তার বংশেরই নাম। তিনি তো কোনো ইংরেজ নাম দেননি।'

তর্কে সুবিধা করতে না পেরে ভাবি আবার তাঁর আগের অংক্রমণে ফিরে এলেন।

'তোমার আর তোমার ভাই রবার্টের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে রবার্ট হলো কর্তব্যপরায়ণ আর তুমি কেবল সুযোগ খুঁজে বেড়াও।'

'ঐ সুযোগ খোঁজাটাও তো একটা কর্তব্য। সুযোগের সদ্ব্যবহারটাই বা কজন লোক করতে পারে,' হাসতে হাসতে আমি বললাম।

'তোমার সঙ্গে তর্ক করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আমার অনেক কাজ রয়েছে,' এ কথা বলে ভাবি রেগেমেগে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন। রবার্ট আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'খুব রাগিয়ে দিয়েছ দেখছি।'

আমি হাসলাম।

হঠাৎ আমার মনে হলো একবার রুরিতানিয়া ঘুরে এলে কেমন হয়। ভাবলে অবাক লাগতে পারে এত দেশ ঘুরলেও আমি রুরিতানিয়ায় কখনও বেড়াতে যাইনি কেন। ঐ রাজরক্ত আমার ধমনিতে প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আমি এতদিন কেন রুরিতানিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইনি। এর কারণ রয়েছে। আমার বাবার এলফবার্গ-প্রীতি ছিল। সেজন্য তিনি ছোট ছেলে বা আমার, রুডলফ, এই নামকরণ করেছিলেন। কিন্তু এলফবার্গ প্রীতি থাকলেও তিনি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আমার রুরিতানিয়ায় যাবার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে নিয়ে এবং রোজ ভাবির পরামর্শ শুনে রুরিতানিয়াকে শতহাত তফাতে রাখবার নীতি অনুসরণ করে আসছিলাম। ভাই ভাবি চাইতেন না আমি সে দেশে যাই। এই কারণেই এত দেশ ঘুরলেও আজ পর্যন্ত আমার রুরিতানিয়ায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু যে মুহূর্তে রুরিতানিয়ার কথা আমার মাথায় এল তখন থেকেই দেশটাকে

দেখবার কৌতূহল যেন আমাকে পেয়ে বসল। আমার সংকল্পটা আরও বেড়ে গেল 'দি টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ পড়ে। সংবাদটা হলো এই রুরিতানিয়ার নতুন রাজা পঞ্চম রুডলফের অভিষেক হবে রাজধানী স্ট্রেলজো নগরীতে। আর মাত্র তিন সপ্তাহ পরেই সেই অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে। খুব জাঁকজমক—খুব ঘটা হবে সেইসময়। নানারকম অনুষ্ঠান হবেই। কাজেই এসময় রুরিতানিয়ায় বেড়াতে গেলে সে সব দেখা যাবে—উপভোগ করা যাবে। সুতরাং মনস্থির করে ফেলতে আমার দেরি হলো না। আমি যাত্রার আয়োজন শুরু করলাম। বেড়াতে যাবার সময় কোথায় যাচ্ছি এ কথা আত্মীয়স্বজন, এমনকি একান্ত আপনজনদের কাছে বলে যাওয়া আমার ধাতে নেই। আর এক্ষেত্রে তো ভাই-ভাবিকে কিছু বলাই চলবে না, কেননা আমি রুরিতানিয়া যাচ্ছি শুনলে ওঁরা দু'জনেই বাধা দেবেন।

আমার যাত্রার আয়োজন দেখে ভাবি জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কোন মুল্লুকে যাচ্ছ?'

'টাইরলে যাচ্ছি।'

'টাইরলে? হঠাৎ সেখানে কেন?'

'না, আলসেমি করে তো এতকাল কাটালাম, এবার সত্যিই একটা কিছু করব। তোমার খোঁটা আর সহ্য করা যাচ্ছে না, একখানা বই লিখব টাইরল আর তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে। সে বই-এর উপাদান সংগ্রহ করবার জন্যই টাইরল যাচ্ছি। সত্যিই তো এতখানি বয়স হলো, আজ পর্যন্ত কাজের মতো কাজ তো একটাও করতে পারলাম না। সৈন্যদলে ঢুকেছিলাম, সে চাকরিও তো ছেড়ে দিলাম।'

'বই লিখবার পরিকল্পনাটা কিন্তু মন্দ নয়,' একটু উৎসাহের সুরেই ভাবি বললেন।

'আর সেজন্যই তো উপাদান সংগ্রহের কাজে যাচ্ছি।'

'কিন্তু তুমি কি শেষপর্যন্ত স্থির হয়ে বসে বই লিখতে পারবে?' ভাবির গলায় কেমন যেন একটু সন্দেহের সুর বেজে উঠল।

'কিচ্ছু ভেবো না ভাবি, আমি ঠিক লিখে ফেলব। উপাদান সংগ্রহ করতে পারলে বই লিখতে আর কদিন লাগবে।' ভাই-ভাবির আমার কথায় বিশ্বাস হলো। তাঁরা আমার বিদেশ যাত্রায় কোনো বাধা দিলেন না। আমি বেরিয়ে পড়লাম। আমার এবারের যাত্রার লক্ষ্য রুরিতানিয়ার রাজধানী স্ট্রেলজো নগরী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
জেন্ডার সরাইখানায়

আমার চাচা উইলিয়মের নীতি ছিল অন্তত চব্বিশটি ঘণ্টা না কাটিয়ে কেউ যেন প্যারিস শহর থেকে চলে না যায়। জগৎ সম্বন্ধে চাচার পরিপক্ক অভিজ্ঞতা। চাচামশাই-এর উপদেশ তো আর অগ্রাহ্য করা যায় না। তারই সম্মানে একদিন একরাত অর্থাৎ পুরো চব্বিশটি ঘণ্টা প্যারিসে কাটাব বলে ঠিক করলাম। উঠলাম হোটেল কাতিনাতালে। সেখান থেকে প্যারিসের ব্রিটিশ দূতাবাসে বন্ধু জর্জ ফেদারলির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সে দূতাবাসেই চাকরি করে।

জর্জ তো আমায় পেয়ে মহা খুশি। আমরা একসঙ্গে ডিনার খেলাম। তারপর জর্জ আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শহর দেখাবার জন্য। সন্ধ্যাবেলায় আমরা অপেরায় গেলাম। তারপর ছোট্ট সাপার সেরে শয্যা আশ্রয় করলাম।

পরদিন জর্জ ফেদারলি আমার সঙ্গে স্টেশনে এল, আমি স্ট্রেলজোর টিকিট না কিনে ড্রেসডেনের টিকিট কাটালাম।

'ছবি* দেখতে যাচ্ছ?' জর্জ জিজ্ঞেস করল।

জর্জ হলো এক দারুণ গল্পবাজ ছেলে। ওর পেটে মোটে কথা থাকে না। ওকে যদি বলি যে আমি রুরিতানিয়া যাচ্ছি তবে খবরটা লন্ডনে পৌঁছতে তিনদিনের বেশি সময় লাগবে না। কাজেই জর্জের প্রশ্নের জবাবে আমি একটা এড়িয়ে যাওয়া দায়সারা গোছের উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ জর্জ আমার কাছ থেকে ছুটে চলে গেল। সত্যি কথা না বললে—সঠিক উত্তর না দিলে একটা বিবেকের তাড়না ভোগ করতে হতো। জর্জ নিজেই আমাকে সে তাড়নার হাত থেকে বাঁচাল।

আচমকা জর্জ ছুটে যাওয়ায় আমি একটু অবাকই হলাম। দেখলাম মাথার টুপি খুলে ও একজন মহিলাকে অভিবাদন করল। মহিলাটি সুদর্শনা—কান্তিমতী। তাঁর পরনে কেতাদুরস্ত পোশাক পরিচ্ছদ। একনজরেই বোঝা যায় যে তিনি অভিজাত বংশীয়। মহিলাটি সবে স্টেশনের বুকিং অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। দীর্ঘাঙ্গিনী

* ছবির গ্যালারি আর মিউজিয়মের জন্য ড্রেসডেন বিখ্যাত।

এই সুতনুকা নারীর বয়স তিরিশ থেকে দু'এক বছর বেশি হতে পারে। জর্জ যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল তখন মহিলাটি আমার দিকে দু'একবার তাকিয়েছিলেন। কিন্তু ফার কোট, নেক-র‍্যাপার আর কান পর্যন্ত টানা নরম ট্র্যাভেলিং হ্যাটের জন্য আমাকে বোধ হয় খুব একটা সুশোভন দেখাচ্ছিল না। আর সেই জন্যই বুঝি ঐ সুন্দরী আধুনিকা আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য কোনো ঔৎসুক্য বা আগ্রহ দেখালেন না। আমার অহমিকা বোধ একটু আহত হলো, একটু পরেই জর্জ আমার কাছে ফিরে এল।

'তুমি এক চমৎকার ভ্রমণ সঙ্গিনী পেয়েছো হে,' উৎসাহের সঙ্গে জর্জ বলতে লাগল, 'ভদ্রমহিলার নাম আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান। তোমার মতো উনিও ড্রেসডেনে যাচ্ছেন। আশ্চর্য উনি তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলেন না।'

'আমিও তো পরিচিত হতে চাইনি,' একটু বিরক্ত হয়েই আমি বললাম

'আমি আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম,' একটু বিব্রত ভাবেই জর্জ বলল, 'কিন্তু ভদ্রমহিলা নিজেই বললেন "অন্য সময়ে হবে," তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো আর জোর করে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি না। যাকগে, হয়তো মহিলা কোনো দুর্ঘটনায় পড়বেন আর তা থেকে তুমিই হয়তো তাঁকে উদ্ধার করবে। ডিউক অভ স্ট্রেলজোকে সরিয়ে তুমিই হয়তো ওঁর প্রিয় পাত্র হয়ে উঠবে।'

'কিন্তু এই আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান মহিলাটি কে? ডিউকের সঙ্গেই বা তাঁর কি সম্পর্ক?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কিছুদিন আগে ডিউক মাইকেল প্যারিসে বেড়াতে এসেছিলেন। মাদাম দ্য মোবানের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। মাদামের দিকে ডিউকের একটু বিশেষ মনোযোগ লক্ষ করা গিয়েছিল। মাদাম হলেন অভিজাত বংশের এক বিধবা। নিজের চোখেই তো দেখলে যে উনি অত্যন্ত সুদর্শনা, ওঁর অর্থের অভাব নেই। লোকে বলে উনি নাকি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষিনী। আর ডিউক? যেমনটি হতে হয় তিনি ঠিক তেমন। রাজবংশের সন্তান, সুতরাং রাজকীয় পদমর্যাদার অধিকারী। রুরিতানিয়ার ভূতপূর্ব রাজার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান হলেন ডিউক মাইকেল, সুতরাং তিনি নতুন রাজার বৈমাত্রেয় ভাই। ডিউক মাইকেল ছিলেন তাঁর বাবা অর্থাৎ রুরিতানিয়ার প্রাক্তন রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। বাবা হয়তো মাইকেলকেই রাজা করে যেতে পারলে খুশি হতেন, কিন্তু দেশের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে তো আর তিনি যেতে পারেন না। কাজেই প্রথম পক্ষের সন্তান এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র রুডলফই রুরিতানিয়ার রাজপদে অভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন। অবশ্য ভূতপূর্ব রাজা তাঁর ছোট

ছেলের জন্যও যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করে গেছেন। ছোট ছেলেকে তিনি 'ডিউক'* করে গেছেন, আর এর ডিউকও যে সে জায়গায় নয়, খাস রাজধানী স্ট্রেলজো নগরীর। আমাদের এই রাজভ্রাতাটি হলেন প্রিন্স মাইকেল, ডিউক অভ স্ট্রেলজো। ভূতপূর্ব রাজার এই কাজের ফলে কিছু বিরূপ মন্তব্যের সূত্রপাত হয়েছিল। রাজার দ্বিতীয়া স্ত্রী অর্থাৎ মাইকেলের মা ভালো পরিবারের মেয়ে হলেও খুব একটা খানদানি অভিজাত বংশের সন্তান ছিলেন না।'

'তা ডিউক তো এখন প্যারিসে নেই?' আমি প্রশ্ন করলাম

'না না, তিনি নতুন রাজার অভিষেক উৎসবে যোগদান করবার জন্য দেশে ফিরে গিয়েছেন, এ উৎসবটি তিনি ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবেন না।'

'কেন?'

'ডিউক মাইকেল অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, সিংহাসনের দিকে তাঁর নিজেরই দৃষ্টি রয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনের একান্ত বিরোধী না হলে তিনি নিজেই রাজপদ লাভ করবার চেষ্টা করতেন, রাজ্যে তাঁর সমর্থকেরও অভাব নেই। কিন্তু জোর করে ক্ষমতা দখল করবার চেষ্টা করে মাইকেল জনপ্রিয়তা হারাতে চান না।'

ট্রেন এসে যাওয়ায় আমাদের কথাবার্তায় এখানেই ছেদ পড়ল। আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আমাদের? হ্যাঁ আমার আর মাদাম আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান-এর। অবশ্য আমরা দুজনে ট্রেনের এক কামরায় উঠলাম না। জর্জ যে দুর্ঘটনার ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, পথে সেরকম কিছু ঘটল না। কাজেই আমার আর মাদামের মধ্যে পরিচয়ের সুযোগ হলো না। অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে আমি আরও কিছু সংবাদ দিতে পারি। ড্রেসডেনে এক রাত বিশ্রাম করে পরদিন আমি আবার যাত্রা শুরু করলাম। দেখলাম মাদাম মোবানও একই ট্রেনে উঠলেন।

তাহলে উনিও রাতটা ড্রেসডেনেই কাটিয়েছেন। তিনি আলাপ পরিচয় করতে ইচ্ছুক নন—তিনি একলা থাকতে চান এটা বুঝতে পেরে আমিও তাঁকে না ঘাঁটিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চললাম। দেখলাম তাঁর গন্তব্যস্থল একই। আমি যে পথ ধরে যাচ্ছি, তিনিও সে পথেই যাচ্ছেন। মাদামের অলক্ষে তাঁকে দেখবার সুযোগ পেলে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লাম না।

ট্রেন পৌঁছল রুরিতানিয়ার সীমান্তে। কাস্টমস অফিসের বৃদ্ধ বড়কর্তা এমন

* ডিউক : অভিজাত সামন্ত শ্রেণির মধ্যে উচ্চতম পদ মর্যাদা, সম্মান এবং ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অধীনে এই ডিউকরা নিজ এলাকার এক একজন ছোটখাট রাজারই মতো।

দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যে আমি আমার চেহারার এলফবার্গ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও সচেতন—আরও নিশ্চিত হলাম।

কয়েকখানা খবরের কাগজ কিনলাম। কিন্তু কাগজে যে সংবাদ দেখলাম তাতে আমার গতিবিধি পালটে ফেলবার চিন্তা করতে হলো। সংবাদে দেখলাম কোনো অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে অভিষেকের দিন হঠাৎ এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মানে কাল বাদে পরশুই রাজা পঞ্চম রুডলফের রাজ্যাভিষেক। সারা দেশ মেতে উঠেছে আসন্ন উৎসবের জন্য। দলে দলে লোক ছুটছে রাজধানী স্ট্রেলজোর দিকে। বিদেশ থেকেও অনেকে আসছে। রাজধানীতে এখন লোকের ভিড়। ভাড়া দেবার মতো একখানা ঘরও খালি নেই। হোটেলগুলিও লোকের ভিড়ে উপচে পড়ছে। এখন রাজধানীতে মাথা গুঁজবার একটুখানি ঠাঁই পাবার আশা নিতান্তই দুরাশা। ভাগ্যক্রমে যদি একটু জায়গা পাওয়া যায়ও তবে সেজন্য অনেক মূল্য দিতে হবে।

ঠিক করলাম আপাতত রাজধানী স্ট্রেলজোতে যাব না, পথে কোনো একটা স্টেশনে নেমে পড়ব। সেখানে নিশ্চয়ই রাজধানীর মতো ভিড়ভাট্টা থাকবে না। মাথা গুঁজবার জায়গা? তা সে প্রায় সব স্টেশনের কাছেই থাকে। স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা যতই কম হোক না কেন, তৃতীয় শ্রেণির একটা হোটেলেও যদি একখানা ঘর পাওয়া যায় তবে নিজের খরচেই না হয় ঘরখানাকে যতদূর সম্ভব বাসযোগ্য করে নেব।

'টাইমটেবল'-এর পাতা উলটাতে লাগলাম। দেখেশুনে মনে হলো জেন্ডা জায়গাটাই হয়তো এদিক থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে। জায়গাটা রুরিতানিয়ার সীমান্ত থেকে মাত্র দশমাইল ভিতরে। আর ওখান থেকে রাজধানী স্ট্রেলজো মাত্র পঞ্চাশ মাইল। ট্রেনে গেলে মোটে দেড়ঘণ্টার পথ। আর জেন্ডা জায়গাটা নেহাত গুরুত্বহীনও নয়। ওখানে একটা কেল্লা রয়েছে। স্টেশন, কেল্লা এসব যখন রয়েছে তখন একটা দুটো হোটেল কি আর থাকবে না?

ট্রেন জেন্ডা স্টেশনে পৌঁছবে সন্ধ্যা নাগাদ। রাতটা হোটেলে কাটিয়ে কাল অর্থাৎ মঙ্গলবারটা কাটাব জেন্ডার পাহাড়, বনভূমি আর বিখ্যাত কেল্লা দেখে। শুনেছি জেন্ডার পাহাড় আর বনভূমির দৃশ্য নাকি খুব চমৎকার। পরশুদিন অর্থাৎ বুধবার সকালে ট্রেনে করে যাব স্ট্রেলজো নগরীতে। সেখানে অভিষেক উৎসব দেখব। সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে আসব জেন্ডায়। নিরিবিলি হোটেলে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুম দিয়ে শরীরের ক্লান্তি দূর করব। প্রয়োজন বুঝলে পরদিন আবার না হয় যাব রাজধানীতে।

এসব ভেবেচিন্তে জেন্ডা স্টেশনেই নেমে পড়লাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেখলাম একখানা কামরায় জানালার কাছে বসে আছেন মাদাম দ্য মোবান। বুঝলাম উনি সোজা স্ট্রেলজোতেই যাচ্ছেন। আমার থেকে অনেক বেশি ভেবেচিন্তে কাজ করেছেন ভদ্রমহিলা। উনি নিশ্চয়ই আগেভাগে স্ট্রেলজোতে থাকবার একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মাদাম আর আমি একই ট্রেনে এতটা পথ এসেছি এ কথা জানলে বন্ধু জর্জ ফেদারলি কতখানি অবাক হবে, এ কথা ভেবে আমি নিজের মনেই হাসলাম।

হুস্ হুস্ করতে করতে ট্রেন প্লাটফর্ম পেরিয়ে চলে গেল। বাহ! জেন্ডা জায়গাটা তো সত্যিই চমৎকার! এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের পর পাহাড়। পাহাড়ের কোলে কোলে বিস্তীর্ণ বনস্থলি। অস্ত-সূর্যের রক্তিম আলো পাহাড় আর বনভূমিকে অপূর্ব এক বর্ণসুষমায় রাঙিয়ে তুলেছে।

চমৎকার! জেন্ডাতে নেমে ভালোই করেছি। না নামলে তো এ অপুর্ব দৃশ্য দেখা যেত না।

কিন্তু অন্য দিক থেকে আমাকে নিরাশ হতে হলো। ভেবেছিলাম একটা সাধারণ হোটেল অন্তত থাকবে এখানে, কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে মাথা গুঁজবার যে জায়গাটি পাওয়া গেল তাকে কোনো মতেই হোটেল বলা চলে না—বড়জোর বলা যেতে পারে একটা সরাইখানা।

সরাইখানা যারা চালাচ্ছে তারা লোক মন্দ নয়। একজন মোটা বৃদ্ধা মহিলা তার দুই মেয়েকে নিয়ে এ সরাইখানা চালাচ্ছেন। ছোট মেয়েটি বেশ হাসিখুশি। তার নাম ফ্রিস্কা। বয়স আঠার থেকে কুড়ির মধ্যে।

তা এ সরাইখানায় অতিথি অভ্যাগতের আগমন কোনো কালেই খুব বেশি নয়। এখনও সরাইখানাটা প্রায় ফাঁকা। সহজেই দোতলার একখানা বড়সড় ঘর পেয়ে গেলাম। এরকম ঘরে দু'চারদিন থাকতে খুব একটা কষ্ট হবে বলে তো মনে হলো না।

নিজের ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ডিনার খেতে নামলাম, আলাপ জমিয়ে নিলাম ফ্রিস্কা আর তার মায়ের সঙ্গে। দেখলাম রাজধানীর অভিষেকে উৎসবের ঘনঘটা নিয়ে ওরা খুব একটা উৎসাহী নয়। বৃদ্ধার 'হিরো' হলো ডিউক মাইকেল। ভূতপূর্ব রাজার 'উইল' অনুসারে ডিউক মাইকেলই এখন জেন্ডার জমিদারি আর কেল্লার মালিক। উপত্যকার শেষে একটা খাড়াই পাহাড়ের মাথায় রয়েছে কেল্লাটা। আশপাশের বিস্তীর্ণ বনভূমিও ডিউকের সম্পত্তি। ছোট ছেলেকে রাজা করতে না

পারলেও প্রাক্তন রাজা তাঁকে যতদূর সম্ভব পুষিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। জেন্ডার বিখ্যাত কেল্লাটা সরাইখানা থেকে মাইল খানেক দূরে। এসব খবর অবশ্য জানলাম বৃদ্ধা আর তাঁর দুই মেয়ের কাছ থেকে।

বৃদ্ধা সরাইওয়ালী ডিউক সিংহাসনে বসতে না পারবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে একটুও ইতস্তত করলেন না।

'আমরা ডিউক মাইকেলকে জানি। তিনি চিরদিন আমাদের মধ্যেই থেকেছেন। তিনি আমাদের আপনজন। রুরিতানিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ তাকে চেনে—জানে। রাজা আমাদের কাছে প্রায় একজন অপরিচিত লোকেরই মতো। তিনি এ পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন। দশজন রুরিতানিয়াবাসীর মধ্যে একজনও রাজাকে দেখলে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ।'

'কেউ জানে না এখন আমাদের রাজা মশাই দেখতে কেমন হয়েছেন,' মুচকি হেসে ফ্রিস্কা বলল।

'কেন?' বৃদ্ধা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'রাজামশাই নাকি দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন, কাজেই বলা যেতে পারে তাঁকে কেউই চেনে না।'

'দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন!' অবাক হয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'তোকে এ কথা কে বলেছে?'

'কেন কাল রাতে জোহানই তো বলল।'

'জোহান হলো ডিউকের বনরক্ষী,' আমার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'রাজা আপাতত এখানেই রয়েছেন, তিনি রয়েছেন ডিউকের শিকার-বাড়িতে। এখান থেকেই বুধবার ভোরে তিনি যাত্রা করবেন স্ট্রেলজোর দিকে—অভিষেকের জন্য।'

'রাজা বুঝি শিকার করতে খুব ভালোবাসেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালোবাসেন। তা যতদিন খুশি তিনি তাঁর শিকার নিয়ে এখানে থাকুন না কেন। ওদিকে নির্দিষ্ট দিনে রাজধানীতে ডিউকের রাজপদে অভিষেকটা হয়ে যাক। ভাই-এর বদলে ডিউক রাজা হলেই আমরা খুশি হব।'

'আমি অন্তত খুশি হব না,' ফ্রিস্কা বলল, 'কালো মাইকেলকে* আমার

* মাথার লাল চুল হলো এলফবার্গ রাজবংশের সন্তানদের চেহারার একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ডিউক মাইকেলের মাথার চুলের রং লাল নয়—কালো। এজন্য সে কালো মাইকেল নামেই পরিচিত।

একদম পছন্দ হয় না।'

কঠোর দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'এখনও তোর লঘুগুরু জ্ঞান হয়নি। বলতে হয় ডিউক মাইকেল। এতটা বয়স হলো, এখনও কাকে কী বলতে হয় তাই শিখলি না।'

'তুমি যা-ই বল না কেন আমার পছন্দ লাল চুল। আমাদের রাজার চুল নাকি টকটকে লাল ঠিক আমাদের অতিথির মাথার চুলের মতো।'

আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল মিষ্টি চেহারার ছোট মেয়েটি। 'রাজা যদি এখানে, তবে ডিউক কোথায়? তিনিও কি এখানেই রয়েছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ডিউক রয়েছেন স্ট্রেলজোতে। তিনি স্বয়ং অভিষেকের সমস্ত ব্যবস্থা তদারক করছেন,' বৃদ্ধা উত্তর দিলেন।

'দু'ভাই এর মধ্যে তাহলে বেশ সদ্ভাব আছে?'

'হ্যাঁ,' বৃদ্ধা উত্তর দিলেন।

'মোটেই না,' মাথা ঝাঁকিয়ে চঞ্চলা ফ্রিস্কা বলল।

'নেই?'

'কী করে সদ্ভাব থাকবে বলুন, দু'জনেই চান একই সিংহাসন আর একই রাজকন্যাকে।'

'রাজকন্যা?'

'হ্যাঁ মশাই, রাজকন্যা ফ্লাভিয়া। সবাই জানে কালো মাইকেল—থুরি আমাদের ডিউক—রাজকন্যাকে ভালোবাসেন। কালো মাইকেল রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চান।'

'এই রাজকন্যাটি কে?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। চপলা ফ্রিস্কা কোনো বেফাঁস কথা বলবার আগেই বৃদ্ধা আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'রাজকন্যাটি হলেন আমাদের রাজবংশেরই মেয়ে। অবশ্য ছোট তরফের। রাজকন্যা ফ্লাভিয়ার বাপ-মা ভাই-বোন কেউ নেই। রাজ বংশের ছোট তরফের মেয়ে কাজেই বেশ বড়সড় একটা জমিদারি আছে। আর আছে একখানা বিরাট প্রাসাদ। ঝি-চাকরদের নিয়ে রাজকন্যা নিজের প্রাসাদেই থাকেন। আমাদের এই রাজকন্যাটি বড় ভালো মেয়ে মশাই।'

চপলা ফ্রিস্কা মায়ের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মোটেই দমে যায়নি, সে ফস করে বলে উঠল, 'ঐ অচেনা মাতাল রাজা আর শয়তান কালো মাইকেলকে বাদ দিয়ে দেশের

লোক যদি রাজকন্যা ফ্লাভিয়াকে সিংহাসনে বসাত তবে দেশটার ভালো হতো।'

'কী বলছিস তুই?' বৃদ্ধা মেয়েকে ধমক দিলেন। মায়ের ধমকে একটুও দমে না গিয়ে মুখ ফোঁড় ফ্রিস্কা বলল, 'ঠিকই বলছি। রাজাটা তো একটা বেহেড মাতাল আর কালো মাইকেলটি হচ্ছে একটি আস্ত শয়তান...'

ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল ঘরের বাইরে। ফ্রিস্কার কথার স্রোত বন্ধ হলো। হেঁড়ে গলায় কে যেন ধমকে উঠল, 'মহামান্য ডিউকের নিজের শহরে বসে কে তাঁকে গালাগালি দিতে সাহস করছে?'

ঘরের ভিতর ঢুকল লম্বা চওড়া পালোয়ান গোছের একটি লোক।

ফ্রিস্কা আর্তনাদ করে উঠল। সে আর্তনাদের অর্ধেকটা ভয়ের আর বাকি অর্ধেকটা মজা করবার জন্য।

'কার এতবড় দুঃসাহস,' পালোয়ান লোকটি আবার ধমকে উঠল তার ধমকের মধ্যেও বুঝি কৌতুকের একটুখানি পরশ রয়েছে। 'তুমি তো আর আমার নামে নালিশ করবে না,' মুচকি হেসে ফ্রিস্কা বলল।

'দ্যাখ, তোর বকবকানির ফলটা কী হলো। এখন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে জানে?' গম্ভীর ভাবে বৃদ্ধা বললেন।

মায়ের কথায় কান না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফ্রিস্কা বলল, 'এ হলো আমাদের বন্ধু জোহান। ডিউকের বন-রক্ষক। শুধু তা-ই নয়, ডিউকের কেল্লার সব কিছু দেখাশোনা করবার ভার ওর ওপরেই রয়েছে। ডিউক নিজে তো আর সবসময় এখানে থাকেন না।'

'আমাদের এখানে একজন অতিথি আছেন। উনি ইংল্যান্ডের এক জমিদার পরিবারের সন্তান। এস জোহান, তোমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দি,' জোহানের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা বললেন।

জোহান টুপি খুলল। পরমূহূর্তেই সে দেখতে পেল আমাকে। অবাক হয়ে দেখলাম, আমাকে দেখেই সে থতমত খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল—যেন সে আশ্চর্যজনক কিছু একটা দেখেছে।

'তোমার কী হলো জোহান?' বড় মেয়েটি বলল, 'ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছেন, উনি অভিষেক উৎসব দেখতে চান।'

লোকটি ততক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। কিন্তু সে তখন আমার দিকে তাকিয়ে ছিল তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে।

'শুভ সন্ধ্যা,' আমি বললাম।

'শুভ সন্ধ্যা হুজুর,' আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে জোহান বলল। তার ভাবভঙ্গি আর রকমসকম দেখে আমুদে মেয়ে ফ্রিস্কা খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল,

'দেখ জোহান, এ ঠিক তোমার পছন্দের রং। আপনার চুলের রং দেখে জোহান চমকে গিয়েছে। এরকম লাল রঙের চুল আমরা সচরাচর জেন্ডায় দেখতে পাই না।'

'ক্ষমা করবেন হুজুর,' জোহানের কণ্ঠস্বর যেন তোতলা হয়ে গিয়েছে। তার চোখের দৃষ্টি তখনও বিস্ময়-বিমূঢ়।

'আমি এখানে কাউকে দেখতে পাব বলে ভাবিনি, তাই আপনাকে দেখে চমকে গিয়েছিলাম, আমাকে ক্ষমা করবেন,' জোহান বলল।

'ওকে এক পাত্র পানীয় দাও,' ফ্রিস্কার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমার স্বাস্থ্য পান করুক। এবার আমি আপনাদের শুভরাত্রি জানাচ্ছি। সৌজন্য আর সুন্দর কথাবার্তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মহিলাদের, কয়েকটা ঘণ্টা বেশ চমৎকার কাটল।'

এ কথা বলে আমি উঠে পড়লাম। ছোট্ট একটা বো করে আমি দরজার দিকে এগোলাম।

'দাঁড়ান, আমি আপনাকে আলো দেখাচ্ছি,' ফ্রিস্কা ছুটল আলো আনবার জন্য। আমাকে যাবার পথ দেবার জন্য জোহান একটু সরে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি তখনও জামার ওপর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত কী দেখছে সে? আমি তার কাছাকাছি আসতেই সে এক পা এগিয়ে এসে একট দ্বিধা জড়িত স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করল,

'হুজুর, আপনি কি আমাদের রাজামশাইকে চেনেন?'

'না, তাকে আমি কখনও দেখিনি। তবে বুধবার তাঁকে দেখতে পাব বলে আশা করি,' আমি উত্তর দিলাম।

আর কিছু বলল না জোহান। তবে বেশ বুঝলাম যতক্ষণ আমার পিছনের দরজাটা বন্ধ না হলো ততক্ষণ জোহানের দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করল।

ব্যাপার কী? জোহানের ভাবভঙ্গিতে একটু অবাকই হতে হলো।